KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হরিঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪ বৈশাখ ১৩২৪ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

পাত্র ও পাত্রী।

——ঃ০ঃ——

ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে—কাঁচাঘুমে চমক্ লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আস্‌তে চায় না—আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন আমি কৌমার্য্যের লাস্‌ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়ি-কাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়স বিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক্ আর অখাদ্যই হোক্, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখ্‌লেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশী এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড় ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐ রকম কোনো একটা জায়গায়। গোড়াতেই বলে' রাখা ভাল, দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশী তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কি-একটা ব্রত, দক্ষিণা এবং ভোজন ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এই রকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিত মশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দান দক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্ম্মটা এই—আমার ত কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ করে যত্ন করে তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ সে শিশুও বটে সুশীলাও বটে—আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায় মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্ত্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিত মশায় বল্লেন, তাঁর "পরিবার" কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি

হল না; কেননা রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বল্লেন, মেয়েটি সুলক্ষণা, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠ্‌ল। যে-পণ্ডিত মশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেচি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মত হঠাৎ সুবন্ত প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বল্লেন, "সন্তু, পণ্ডিত মশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেচে, খেয়ে দেখ্।" মা জান্‌তেন আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেচে, কিন্তু মনে আছে রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া—আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট; সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়চে রং শাম্‌লা, ভুরু জোড়া খুব ঘন, এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মত, বিনা সঙ্কোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েচে। আর যাই হোক্ তাকে দেখতে নেহাৎ ভালমানুষের মত।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠ্‌ল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙ্‌তা-জড়ানো-বেণীওয়ালা জ্যাকেট্‌-মোড়া সামগ্রীটি ষোল আনা আমার,—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয় কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্চেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আস্‌চি, স্ত্রী বল্‌তে কি বোঝায় তা আমার ঐ-সূত্রে জানা ছিল। দেখেচি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রী ব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালবাস্‌তেন তা জানি কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন কিসে তাঁর বিরক্তি হবে এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ, কিন্তু মানুষের না কি ওটা অবৈধ পাওনা এই জন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সে দিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠ্‌ল। সে দিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম—এমন কি, সগর্ব্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখ্‌লুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণ কালটা অনুশোচনায় গেল।

সে দিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জান্‌তে পেরেছিল। তার পরে যখনি তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা

পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড় মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে বা কোনো-একটা-কিছু করে সেটা বড় অপূর্ব্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ একমুহূর্ত্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ করে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগ্‌ল। বাবা যে রকম মাকে কর্ত্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল করে তুলেচেন, আমিও মনে মনে তারি ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগ্‌লুম। বাবার অভিপ্রেত কোনো একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে রকম সাবধানে নানা প্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখ্‌লুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কনোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্য্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে বসে তার খাওয়াই হল না এবং জান্‌লার ধারে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচ্‌চে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বল্‌তে পারি নে। ছোট ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশী সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড় চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-

চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠ্‌ল তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখচি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রকম ঘটনাই পূর্ব্বে একদিন ঘটেছিল—এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই,—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়চি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম ; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বল্লুম, "দেখ, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে সেইটে নিয়ে এসত।" কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে ; আমি বল্লুম, "আঃ, এটা নয় ; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।" এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আন্‌লে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। আমি গিয়ে দেখ্‌লুম তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বল্লুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগ্‌ল এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেচে এই অপরাধ কিছুতেই ভুল্‌তে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করচেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এদিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা একমুহূর্ত্তে

কর্ত্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময়ে ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারী রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিত-মশায়কে অর্থলুব্ধ বলে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চল্‌চে, একথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন কি বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেচেন। শুভকর্ম্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েচে। বাবার আদালতের উকীলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এণ্ট্রেন্সস্কুলের সেক্রেটারী বীরেশ্বর বাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেচে। সেক্রেটারি বাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েচেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েচেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুন্‌তে পেলেন। তারপরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের

ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মাম্‌লা ডিস্‌মিস্ এবং প্রচণ্ডতেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙ্‌তা-জড়ানো বেণীসহ কাশীশ্বরাকে নিয়ে তাঁর অন্তর্দ্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্ব্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মত চুপ্‌সে গেল—আকাশে আকাশে হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

(২)

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেচে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিনে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্ব্বেই আমি পূরা দমে এম্ এ, পরীক্ষা পাস করে চোখে চষমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা' দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেচি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো একটা জায়গায়। এতদিন ত শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল এবার অর্থসাগর মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড় বড় পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর সব চেয়ে বড় সহায় যিনি তিন পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্‌সন্ নিয়ে বিলেতে, যিনি আরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদ্‌লি হয়েছেন, আর যিনি বাংলা দেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায়

আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিলনা, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন এবং পেন্‌সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মত চল্‌ত। এখন দিন খারাপ তাই বাবা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ভাব্‌ছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিসে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড় দিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমরা অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য ডেপুটির এম্-এ পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব "প্রাংশুলভ্য ফল"। এইজন্যে কন্‌ট্রাক্টর বাবু আমার প্রতি "উদ্বাহু" হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েচি—অন্তত সে বাহু ডেপুটি বাবুর হৃদয় পর্য্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু আমার হৃদয়টা তখন আরো অনেক উপরে ছিল।

কারণ আমার বয়স তখন কুড়ি পেরয়-পেরয়, তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয় তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারদিকেই সঙ্কুচিত, মনন-সাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে

ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোট মাপে কৃশ করে আনা এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই, সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝঙ্কার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে এমন দুগ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে' বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাট্‌কা বেরিয়ে আমি সেই রকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সাম্‌নে এসে পড়লুম। বাবা বল্লেন "শুভস্য শীঘ্রং।" আমি চুপ করে রইলুম, মনে মনে ভাবলুম একটু দেখে শুনে বুঝে পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম—কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মত ছোট এবং সুন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েচে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট করে' তার ভুরুটি এঁকে তাকে হাতে করে গড়ে তুলেচে। সে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসল-

মান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড় চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালং বাসন-কোসনকে শোধন এবং মার্জ্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্ব্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেচেন যে তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সঙ্গত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভাল কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়, সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেচে। সে যেমন পাল্কীর ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারো মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেশী শ্রদ্ধা যে আর কারো থাক্‌বে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বল্লুম, "মা, এ মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই"—তিনি হেসে বল্লেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!" আমি বল্লুম, "তাহলে আমি বিদায় নিই!" মা বল্লেন, "সে কি সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে ত দেখতে ভাল।" আমি বল্লুম, "মা, স্ত্রী ত কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই!" মা বল্লেন, "শোন একবার! এরি মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কি পেলি!" আমি বল্লুম, "বুদ্ধি থাক্‌লে মানুষ দিনরাত এই সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়!"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েচেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত বাবা যদি অত্যন্ত বেশী রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তাহলে হয় ত কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তাহলে তিনি সময় নিয়ে অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত করে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলি তর্জ্জন গর্জ্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বল্লুম—"ছেলে-বেলা থেকে খেতে শুতে চল্‌তে ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভর উপদেশ দিয়েচেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চল্‌বে না?" কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেচে এ আমি দেখি নি। সঙ্গত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মত কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেচেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েচেন বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে পণ্ডিত-মশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয় পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল—তাহলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম যে ঢের ভাল,

তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌মটাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেচি কিন্তু মনকে ত চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, এ সব যদি আপনি মানেন তবে পাল্‌বার বেলায় মুর্‌গি পালেন কেন? আরো একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্ব্বণ বিধিনিষেধ দান দক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেচেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে', অবলা জাতি স্বভাবতই অবুঝ বলে', মাথা হেঁট করে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েচেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সঙ্গতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়-শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে,—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে' তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা ত থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পাকেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বল্লেন,

"যাও তুমি আত্মনির্ভর করগে!" আমি প্রণাম করে বল্লুম, "যে আজ্ঞে!" মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডরের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চল্‌তে গেল। তারই জোরে ব্যবসা সুরু করে ছিলুম। ঠিক ঊনআশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাট্‌চে তা ঈর্ষা-কাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগ্‌ল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বল্লুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটারের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয় লাঞ্চ্ খেয়েচি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্ খেলেচি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস্ মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্ত্তা শুনেচি। আমার মুস্কিল এই যে, র‍্যাসেলস্, ডেজার্টেড্ ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ ষ্টীল্ পড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েচি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরতেই

চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়জোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা করতে পারি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলা ভাষার যে রকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমী সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠক্‌তে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক্, এই সব বিলিতি গিল্টি করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে-মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুল্‌ল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল সেই যে আমার ব্রহ্মচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়-বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গ গুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্চে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত এরাও তেম্‌নি এক্‌সেণ্টের একটু খুঁৎ কিম্বা কাঁটা চাম্‌চের অল্প বিপর্য্যয় দেখ্‌লে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতি-বেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল, আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান আচমন উপবাসের অকর্ম্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কি করে! বইয়ে পড়েচি একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে কিন্তু মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্দ্ধিত

সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েচেন!

এদিকে বয়স যত বাড়তে চল্‌ল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠ্‌ল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বে-পরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেল্‌বে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেচি ভালবাসা অন্ধ কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর ত কোন ভার নেই। সংসার-বুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরো বেশী চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কি দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু সে গুলো ত ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক-চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে-খর্ব্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেচে জানি কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক্‌ যখন দেখি কোন সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিসেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তাহলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহঙ্কার ধূলিসাৎ হতে থাক্‌ত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাইহীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেচে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। একটা

কথা ভুলে ছিলুম বয়সও বাড়চে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটনাগপুরের এক সহরে গিয়ে দেখি পণ্ডিতমশায় সেখানে শাল বনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বল্লেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠ্‌ব এ তিনি পূর্ব্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য রকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি ত তা বল্‌তে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুর বাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠ্‌লুম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে—কিন্তু তিনি নাৎনীতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্দ্ধক্যের অপরাহ্ণকে নানা রঙে রঙীন করে তুলেছেন। তাঁর অমরু শতক আর্য্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারদিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মত এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে। আমি হেসে বল্লুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপার খানা কি!" তিনি বল্লেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন, এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি একা। বুঝতে পারলুম আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত

হয়ে পড়েচি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে, তাঁর বয়স হয়েচে, কিন্তু আমার যে হয়েচে সে আমি স্পষ্ট জান্‌লুম। বয়স হয়েচে বল্‌তে এইটে বোঝায়, নিজের চারিদিককে ছাড়িয়েই এসেচি—চারপাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেচে। সে-ফাঁক টাকা দিয়ে খ্যাতি দিয়ে বোজান যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্চি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ করচি এর ব্যর্থকতা অভ্যাস বশত ভুলে থাকা যায় কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাক্‌লে আমরা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাৎ। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগরেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্দ্ধক্যে নাৎনী, নাৎবৌ। এমনি করে মেয়েদের মধ্যদিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্ম্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সাম্‌নে আমার ভাবী বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠ্‌ল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে ত চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির

ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্চে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথাটা একটুখানি ভেবে দেখা যাক্। কিন্তু জীবনের যে-অংশে মূলতুবি পড়েচে সে-অংশে আর ত ফিরে যাওয়া চল্‌বে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক সহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি বাবু ধনী বাঙালী মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁসিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। এক দিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবচি এঁকে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না, এমন কি, চাকরকে আমার জিনিস-পত্র প্যাক করতে বলে দিয়েচি হেনকালে বিশ্বপতি বাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বল্লেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক রকম লোকের আলাপ আছে আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই—নন্দকৃষ্ণ বাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালী-ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভাল। সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে এতদূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কি কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভাল কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না। সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন কি তার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বল্লেন, হাঁ, জাতে ছোট বটে কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কি করে? যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণ বাবু তাকে বল্লেন, আপনি ত

শালগ্রাম সাক্ষী করে' পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেচেন এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েচেন। শালগ্রামের কথা বল্‌তে পারিনে কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশী কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইনে।" যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথা গুলি বল্লেন তিনি খুসি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্ত্তমান সহরে এসে ওকালতি সুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুতে ছিলেন,—উপবাসী থাক্‌লেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক্ শেষকালে উন্নতি হতে লাগ্‌ল। কেননা হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে' একটু জমিয়ে বসেচেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ বল্লেন, "সাধুলোক পাই কোথায়?" তিনি বল্লেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।" তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছ তলায় মারা যান। ডাক্তার বল্লে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েচে।

গল্পের এতটা পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মত লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেচে,—না রেখেচে নাম, না রেখেচে টাকা,—তারাই ভগবানের

সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে"—এইটুকু মাত্র বল্‌তেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মত, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চষমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার্ হিয়ার্!"

যাক্ গে। শোনা গেল নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন, দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেচেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়—কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বল্লেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন ত সেটা একটা পুণ্যকর্ম্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েচে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত-স্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বল্লুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না-দেখেই ত আর"—

"না-দেখেই হবে।

"কিন্তু পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড় বেশী নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়ীখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে সে জন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি"—

"সে এখন বলব না, তাহলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে ত তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মত দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশী নেই যে, ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশী নেই যে, লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতি বাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিষ্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল! তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন অন্য সব বিষয়ে যাই হোক এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে? যে-মেয়ের বড় রকমের

আশা আছে তারি আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মত মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্য্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেলে বিলিতি কাগজ পড়চি এমন সময় খবর এল একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বল্লুম। সে বল্লে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই—শাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কি বলি ভাবচি এমন সময়ে সে বল্লে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক্ দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোন পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না।"

সে বল্লে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশী—বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে ইংরেজি বানানের চেয়ে কঠিন তবু

কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হল না। আমি বল্লুম "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বল্লে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করিনে, কিন্তু আমি বিবাহ করবনা।"

আমি বল্লুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বল্‌বেন না।"

"আচ্ছা বল্‌ব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোন কাজে লাগ্‌তে পারি নে?"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তাহলে ভারি উপকার হয়।"

বল্লুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে ইস্কুলের খবর আমি কি জানি! কিন্তু মেয়ে ইস্কুল স্থাপন করতে ত দোষ নেই।

দীপালি বল্লে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে একথার আলোচনা করে দেখ্‌বেন?"

আমি বল্লুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বস্‌লুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুন্‌চ?

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে

শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম্ম এই:—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড় দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনি গৃহে লালিত, দীপালির মতে সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চল্‌চে কিছুতে তার মীমাংসা হচ্চে না। ঠিক এই সঙ্কটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর একটা পাত্রকে খাড়া করে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফ্‌শিটের কাটা অংশের মত বেরিয়ে যেতে বল্‌চে।

আমি বল্লুম, যখন এসে পড়েচি তখন বেরচ্চিনে। আর যদি বেরই তাহলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।

বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্র পরিবর্ত্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেচি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েচে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানিনে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মত বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বল্‌ল। ভেবেছিলুম সময়-মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে। কিন্তু দেখলুম উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো একটা ক্লাস ডিঙিয়েও

প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনীতে ভরে গেছে উপরন্তু একটি নাতিও জুটেচে। কিন্তু বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে—কারণ তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভদ্রতা।

——:০:——

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যোচিত যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়; নচেৎ বাকি থাকে শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব,—কিম্বা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ খণ্ড তো সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতিপরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোকব্যবহার তত সদ্ভাব ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি

সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতি-মাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ রীতি ক্রিয়াকর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিম্বা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিম্বা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে!

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশে সুষমা বিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায় ব্যবহার-কেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকৃত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হত, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে' বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিম্বা মনুষ্যসম্বন্ধের 'লসাণ্ড',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই

পরিমাণ সদ্ভাবপ্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই দ্বিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে-কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে, বা যেতে বসেছে।

তার এক কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময় সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইনযোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হলে বোধহয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিম্বা সকলের কুশলপ্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হতে পারে যে, একালে গুরুলঘু সম্পর্কের দূরতাকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপখুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না,—তাঁরাও যখন কলিকালে পূর্ব্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি-খাজনা এবং উপরি-পাওনার লোভ সম্বরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নাবতে হবে, ও কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জ্জনা করে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের, এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কমবেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি করে, তুমিই বা জানাবে কি করে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহদ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণহীন বেশে সূচিত হোক্। যীশুর পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তচক্ষে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত

এই চিহ্নতন্ত্রের লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজবিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত সংযত করে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে। সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা' একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এই জন্যই বল্‌ছিলুম যে আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজ-কাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূলভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকালভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তর্প্রকৃতিবিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদীসম্মত।

(২)

প্রথমতঃ ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফুল সংযম। উপস্থিত মত পরের যা'তে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতঃই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের

আপাত-সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমার যে-সময় বিশেষ জরুরী কাজ আছে, সে-সময় হয়ত একজন সামান্য আলাপিনী (বা অপরিচিতা) দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। যতক্ষণ তাঁর উঠতে ইচ্ছা না হয়, আমার হাজার অসুবিধা হলেও বল্‌বার জো নেই—"সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা, একি আর ভাল লাগে!" আমাদের দেশে দেখাসাক্ষাতের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নেই বলে' এ বিষয় আরও ভুগতে হয়। কিম্বা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন; আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে—"ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ"; কিম্বা আর একজনকে—"তুমি দু'দিন আগেই যে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে;" কিম্বা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে এটি ঘটেছে;" কিম্বা আর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ভাল হয় না?"

নাঃ—একালেও এদেশে ভদ্রতা বড় কড়া মনিব,—বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। চড়া গলায় কড়া কথা বল্‌বে না, চেঁচিয়ে হাসবে না, লোভীর মত খাবে না, গালমন্দ দেবে না, মুখে মুখে জবাব করবে না, অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে না;—ইত্যাদি নানাপ্রকার নেতিমূলক বিধান তারা বড় হলে মেনে চলতে বাধ্য। এক কথায়, তাদের শরীরকে যেমন লজ্জাবস্ত্রে আবৃত রাখতে হয়, ব্যবহারকেও তেমনি সম্ভ্রমের সূক্ষ্মবর্ম্মে সুসম্বৃত রাখা চাই। ছেলে সম্বন্ধে কড়াকড়ির মাত্রা কিছু কম, কারণ তাদের জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সভ্যসমাজে তাদেরই বা শাসন মন্দ কি?—পাশ্চাত্য দেশে,

যেখানে সমাজক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশা প্রচলিত, সেখানে উভয়পক্ষকেই সামাজিক নিয়মাধীন হয়ে চলতে হয়। আমাদের দেশে সে প্রথা না থাক্‌লেও, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতারক্ষার নিয়ম যথেষ্ট ছিল। এখন যদি সে বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে ত অন্ততঃ একটা কোন কালোচিত আদর্শ যা'তে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এসব বিষয়ে ছেলেবেলার অভ্যাসই প্রবল। দুর্ম্মুখ হওয়াই কিছু তেজস্বিতার পরিচয় নয়, দুর্ব্যবহার করাই কিছু চরিত্রবলের প্রমাণ নয়। বদরাগী ও রাশভারি, এ উভয়প্রকার লোকের মধ্যে সমাজে প্রতিপত্তি কার বেশী?—সভ্যমেব জয়তে, নেতরং!

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে' থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে? অবশ্য সাহিত্য-চর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে, তা যে কেবল লীলাকমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি,—অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই! কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক আর যে-কোনপ্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এ স্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" বলে' আরম্ভ করে' তাঁরা

মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিঁকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করে ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরী বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে; একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হতে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না, চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না; তেমনি বোধহয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না বলেই ভগবান দয়া করে অজ্ঞানের আড়াল রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়; কিম্বা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রু সাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

(৩)

কিন্তু অল্পমাত্রায় যা' উপকারী, বেশিমাত্রায় তা'তেই হিতেবিপরীত হতে পারে,—যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মন-লাগানো কথা বল্‌ব না বলেই যে পরের মন-যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন

মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না বলে' নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে বলে'ত আমার বিশ্বাস।—ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা করে'ও পরের সুবিধা করে' দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সরল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশো, কুটিল ও কুৎসিৎ। স্বীকার করি, বড়লোক দেখ্‌লে মানুষের মুখের ভাব আপনাহতেই একটু মোলায়েম হয়ে আসে, গলার স্বর অজ্ঞাতসারে অতিকোমল সুরে নাবে; এবং বিলাসপুরের মহারাণী তোমার আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দিলে তাঁর সমাদরের জন্য তুমি আমি যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ব, ও-পাড়ার পাঁচিধোবানী বেড়াতে এলে মোটেই সেরকম হব না! কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত সামাজিক স্তরভেদঘটিত ব্যবহারতারতম্যের সঙ্গে স্বার্থমূলক বাড়াবাড়ির যে তফাৎ, আশা করি চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা' দেখানো অনাবশ্যক। গায়ে পড়ব না মনে করলেই কি দশ হাত দূরে থেকে মানুষকে নখী দন্তী শৃঙ্গীর দলে ফেলতে হবে?—দুঃখের বিষয়, যতদিন বড়লোকমাত্রই প্রায় খোসামোদের বশ থাকবেন, এবং যতদিন পৃথিবীতে বড়ছোটর মধ্যে অবস্থা ও ক্ষমতার এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকবে,—ততদিন খোসামোদকে সমাজ থেকে তাড়ানো মুস্কিল। ভদ্রতাকে এইরকম অনেকে ছদ্মবেশরূপে ব্যবহার করে বলে' অতিভদ্রতাকে লোকে যেন সন্দেহের চক্ষে দেখে; কারণ তারা ঠেকে শিখেছে যে অতিনম্র বিনীত ব্যবহারই দুরভিসন্ধির স্বাভাবিক অস্ত্র! ধর্ম্মের বাহাড়ম্বরও এই দোষে দূষিত। সংসারে জহর দুর্লভ

হলেও তত ক্ষতি ছিল না, যদি জহুরী ততোধিক দুর্লভ না হত! একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কিরকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি করে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত (বা অতিভক্ত!),—যেখানে অক্ষমতা, সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে?—তবে তাদের সবই সুন্দর!

আর একটি জিনিস আছে, যা' ভদ্রতার বেনামী চলে, অথচ বেশি পরিমাণে যা ক্ষতিকর;—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগমুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে' আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে (বেশ একটু উৎসাহ সহকারেই!) তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা করে' দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢেঁকি গিল্‌লেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়! আবার যদি করব বলে' না করি, তাহলে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তুমি সজোরে একটা মত ব্যক্ত করছ, সেটা হয়ত আমার মোটেই মনঃপূত নয়; অথচ আমি চক্ষুলজ্জার খাতিরে হয় চুপ করে' থেকে জানাই যে মৌনং অসম্মতিলক্ষণং,—সেটা বরং ভাল; আর নয় ত আম্‌তা-আম্‌তা করে' তোমার মতে সায় দিয়ে যাই, তা'তে অনেক সময় আমার নিতান্ত অনভিপ্রেত এমন কি অন্যায়

কার্য্যে পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে অন্তরাত্মার অবমাননা করা হয়। কেন এ বিড়ম্বনা?—তার চেয়ে গোড়ায় স্পষ্ট অথচ ভদ্রভাবে 'না' বলতে বা প্রতিবাদ করতে পারলে দু'পক্ষেরই ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা বেঁচে যায়, এবং মতান্তর থেকে মনান্তর পর্য্যন্ত গড়ায় না। 'ভালমানুষ'কে যেমন আমরা 'গো-বেচারা'র দলে ফেলেছি, তেমনি ভদ্রলোক বল্‌তেও যেন দাঁড়িয়েছে এই যে, তাকে যে-সে মনে করলেই ফাঁকি দিতে ও ঠকিয়ে নিতে পারে;—'বৈকুণ্ঠের খাতা' দ্রষ্টব্য। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সম্মিশ্রণ কেন এদেশে এত দুর্লভ? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হতেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হলে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধ-কারীও মাত্রা বুঝে পেড়াপিড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

এইটেই ভদ্রতার প্রধান অসুবিধা,—যে অন্য লোকে শেষ পর্য্যন্ত তার সুবিধাটি আদায় করে' নিতে পারে, তার প্রতি অন্যায় দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না,—কারণ ভদ্রলোক বেচারা কপালে হুণ্ডির ছাপ মেরে বসে' আছে। ভদ্র এবং অভদ্রের সংঘর্ষে প্রথমোক্তকেই অনেক সময় হার মানতে হয়, কেননা পূর্ব্বেই বলেছি কতকগুলি অস্ত্রপ্রয়োগ তার ধর্ম্মবিরুদ্ধ; অভদ্রের ত সে বালাই নেই। গল্প শুনেছি যে বিলাতে বড়লোকেরা রাস্তাঘাটে পারৎপক্ষে ছোটলোকদের অপমানসূচক টিট্‌কারীর প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না,—বিশেষতঃ যদি কোন ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকেন।

(৪)

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থসামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা, আকর্ষণবিকর্ষণ যার যেমনই থাকুক না কেন,—কম হলেও তা'কে পায়ের তলায় ঠাঁসবার দরকার নেই, বেশী হলেও তার পায়ের তলায় পড়ে' থাকবার দরকার নেই। যা'কে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলি ও কর' না, যা'কে মন্দ লাগে তাকে গালাগালি ও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার কর',—এই হচ্ছে তার বিধান। এই সামঞ্জস্যজ্ঞান থেকে একটু নির্লিপ্ত ভাব আসতে পারে,—অবশ্য প্রকাশ্যে। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিৎরা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। (কিন্তু অনুরাগ কমে না বাড়ে?)—পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের আড়ালটুকু রাখ্‌তে চাইনে,—অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য,—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরোয়, এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে' পড়ে।

সেই জন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরাক্তর উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কোন একটি পূজনীয়া আত্মীয়া যখন আমাদের 'তুই' না বলে' 'তুমি' সম্বোধন করতেন, তখনই বুঝতুম যে তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন! ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকের মধ্যে

মনান্তরস্থলে এরূপ কপট ভদ্রতারীতির দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। সেকেলে গৃহিণী যেখানে গয়না খুলে উপোষ করে' চুল এলিয়ে গোসা-ঘরের মেঝেয় লুটতেন, এবং যথাসময়ে সরল মামুলী-ভাবে মান ভাঙ্গিয়ে নিতেন; আজকালকার গৃহিণী সে স্থলে দৈনিক কর্ত্তব্যপালনের তিলমাত্র ত্রুটি না করে'ও মৌখিক ভদ্রতারক্ষার অন্তরালে যে দুর্জ্জয় অভিমান পোষণ করতে পারেন, তা'কে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার! সেকালের সমতল যুদ্ধক্ষেত্র এবং একালের গুহাগহ্বরমণ্ডিত কণ্টকজালখণ্ডিত ক্ষেত্রে যা' তফাৎ,—এও তাই আর কি!—অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্কস্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। এমনও লোক আছেন, যাঁরা বাইরে অতি বিনীত, কিন্তু ঘরে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে' থাকেন! যেন ভদ্রতা একটা পোষাকী বেশ মাত্র, যা ঘরে এসে খুলে না ফেল্‌লে ময়লা হয়ে যেতে পারে! অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা যাদের একসঙ্গে থাক্‌তে হয়, তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার নিয়ম শিথিল না করে' দিলে চলে না, ও সাতখুন মাফ করতেই হয়। তবে আজকালকার যেরকম মতিগতি, তাতে রাশ ঢিলে না দিয়ে টানাই দরকার। এই কথাটাই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, একসঙ্গে থাক্‌তে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য্যভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোকে বুঝতে পারবেন যে,—সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার,

অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা' মুছে ফেলা যায় না; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়িকলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য; কিন্তু একটু ঘন করে' প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেঁকেও বেশিদিন! বাঙ্গালী জাত পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে' তোলবার কোন উপকরণই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

কিন্তু আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এতরকম বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনা-জড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছ-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছনো যায়—যদি কপালে থাকে! এক এক সময় আমার মনে হয় যে হয়ত এতে অনেক সময় নষ্ট হয়; হয়ত দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কত দুর্লভতর বন্ধুত্ববিকাশ হতে পারত, যদি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে না হ'ত। যদি সামাজিক ব্যবধান এত

দুর্ভেদ্য না হত, যদি সামাজিক বিধান এত দুশ্ছেদ্য না হত, যদি প্রত্যেক পরিবার এক একটি দ্বীপের মত স্বতন্ত্র না হত,—তাহলে হয়ত জীবনের অনাবিল সঙ্গসুখের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু বলা যায় না;—সংসারে যদি সজ্জন অপেক্ষা দুর্জ্জনের সংখ্যাই বেশী হয় ত চলিত নিয়মই ভাল। অনেক প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে ছেঁকে এলে তবেই হয়ত স্বচ্ছ জিনিসটি পাওয়া যায়। তা' ছাড়া দুর্লভেরই মূল্য বেশী, তা'ত নিত্যই দেখ্‌তে পাই। একটু দূরতা, একটু দুর্গমতা, একটু রহস্য ভেদ করতে না হলে, একটু কৌতূহলের অবসর না দিলে, মেলামেশার তত আগ্রহ বা আস্বাদ থাকে না। "পড়া পুঁথি সম" আত্মীয়সভার মাঝে একটি বাইরের লোক দৈবাৎ এসে পড়লে সকলে কিরকম তাজা হয়ে ওঠে, ও কথোপকথনের মরাগাঙ্গে কি রকম জোয়ার আসে, তা' অনেকেই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। সেই জন্যই ত নূতনের এত মাহাত্ম্য, অজানার এত আকর্ষণ। (আর সেই জন্যই কি ভগবান নিজেকে রহস্যের জালে আবৃত রেখেছেন?)—অন্ততঃ এই জন্যেও মেয়েদের শিক্ষা বেশী পুরুষালী করবার পক্ষপাতী আমি নই;—তা'তে তাদের বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তাদের স্বকীয় মর্য্যাদা খর্ব্ব করে' নিকৃষ্ট নকলে পরিণত করা হয়।

(৫)

অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলে অবশেষে এইটুকু পাওয়া গেল যে, ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা

ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত করে' সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। 'পঞ্চ্' নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:—এক 'Things that had better been left unsaid'; আর এক, 'Things that ought to have been expressed otherwise।' অর্থাৎ যা না বল্লে ভাল হত, এবং যা অন্যরকমে বলা উচিত ছিল। বাচনিক নিষেধও অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয় "সত্যং ব্রূয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এইরকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানিনে; তবে ইংরাজীতে যাকে ব্যবহারের 'golden rule' (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এ স্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা; ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা। আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক নামক আর দুই মূল শ্রেণীতে ভদ্রতাকে ভাগ করেছি, ও বলেছি যে আজকাল প্রথমোক্তের প্রতিই লোকের বেশী ঝোঁক; এবং সংযম ও সাম্যভাব তার দুই প্রধান সর্ব্বজনান উপাদান। সংযম যে শুধু পরকে

কষ্ট না দেওয়ার বেলায়ই ব্যবহার্য্য তা নয়, কিন্তু যেখানেই সুরুচির ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা, সেইখানেই প্রযুজ্য। সুরুচি পদার্থটি এত সূক্ষ্ম যে, তাকে কোন কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে ধরাবাঁধা যায় না, এবং সমাজের স্তরভেদ অনুসারে তার আকারও বিভিন্ন হয়। কথায়ই বলে লোকের ভিন্ন রুচি। তবে সকল দেশের ভদ্রলোককেই মোটামুটি এক সমাজভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। লোকসমাজে অযথা পরনিন্দা বা আত্মশ্লাঘা, পরের উপকার করে' নিজের মুখে দশবার বলা বা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া, পরের আর্থিক অবস্থা বা অপর গোপনীয় পারিবারিক কথা সম্বন্ধে খুঁচিয়ে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা, অনাহূত পরকে পরামর্শ দান, নিজের টাকার গল্প করা প্রভৃতি যে বাচনিক ক্ষেত্রে মোটেই সুরুচিসঙ্গত নয়,—তা এঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে স্পষ্ট অভদ্রতা,—যথা পরকে মুখের সামনে অপমান, বা মারধোর চেঁচামেচি করা ইত্যাদি আজকাল সভ্যসমাজে বিরল। কিন্তু আমাদের ভদ্রতম সমাজেও সুরুচির ব্যতিক্রম তেমন বিরল নয় দেখে দুঃখিত হতে হয়; ও সেই জন্যই এত কথা বলা। যে ভারতভূমি শিষ্টতার আকর বলে' খ্যাত ছিল, অন্যান্য অবনতির সঙ্গে যাতে এই পৈতৃক সম্বলটুকুও তার নষ্ট না হয়, অন্ততঃ আমরা মেয়েরা বোধহয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলে কৃতকার্য্য হতে পারি। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাকে অপেক্ষাকৃত নীচু আসন দিয়েছি বলে' যেন কেউ এ ভুল বিশ্বাস না করেন যে তাকে একেবারে গৃহ এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় মেয়েরা স্বভাবতঃই কিছু অনুষ্ঠানপ্রিয় বা বাহ্যনিদর্শন-ভক্ত। জানি তুমি ভালবাস, বা তুমি ভক্তি কর, বা তুমি স্নেহ কর,—

তবু মাঝে মাঝে সে কথা বল', কাজে দেখিও, ভাবে জানিও,—"মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো",—এই হচ্ছে তাদের ভাবখানা। বেশী সূক্ষ্ম তারা ধরতে পারে না, বেশী ব্যাপক বুঝতে পারে না;—তারা চোখে দেখতে চায়, হাতে পেতে চায়, প্রকাশ চায়, প্রমাণ চায়। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের শ্রীটুকুও তারা ভালবাসে। কলমের এক আঁচড়ে বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-আচারের চিত্রবৈচিত্র্য ভিন্ন মেয়েদের মন ওঠে না। সেইজন্য পুরুষরা যখন সমাজ-সংস্কারের অছিলায় (এবং হয়ত আসলে খরচ কমাবার অভিপ্রায়ে!) বিবাহের নিমন্ত্রণ-ফর্দ্দ বা ভোজের বাহুল্য ছেঁটে দিতে চান, তখন বাড়ীর মেয়েরা কিছুতেই রাজি হন না। সামাজিক ভদ্রতার অনুষ্ঠান গুলি,—যথা, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের চিঠি পত্র লেখা, অসুখ-বিসুখে খোঁজখবর নেওয়া, ক্রিয়াকর্ম্মে যোগদান, তত্ত্বতল্লাস, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি প্রায়শঃ মেয়েরাই রক্ষা করে' থাকেন, এবং না করতে পারলে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু পুরুষেরা ত দেখেছি পরমাত্মীয় সম্বন্ধেও 'ভাল আছে' এইটুকু দূর থেকে জানতে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে থাকেন; যদিও তাঁরা অনেকেই আত্মীয়ের বিপদে আপদে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এবং স্বজনবৎসল নন তাও বলতে পারি নে। তার এক কারণ বোধহয় এই যে, গৃহ এবং তারই আঙিনারূপ যে সমাজ, তা মেয়েদের জীবনসর্ব্বস্ব, কিন্তু পুরুষদের জীবনের ভগ্নাংশমাত্র। জীবনের আনন্দযজ্ঞে তাঁরা কেবল হোতা, মেয়েরাই যজ্ঞকর্ত্রী। এই সকল কারণে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিদেন মেয়েদের খাতিরে দেশকালপাত্রোপযোগী আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি রক্ষা করে' চলাই ভাল। আত্মীয় বা

অনাত্মীয় অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সময়োচিত দুটো শিষ্ট কথা না বলা বড়ই দৃষ্টিকটু—তা অন্যমনস্কতাবশতঃই হোক, সঙ্কোচবশতঃই হোক, আর অপ্রবৃত্তিবশতঃই হোক্। ভদ্রব্যবহার এমন যন্ত্রবৎ অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে এরূপ অনবধান বা ত্রুটি কোনমতেই সম্ভব না হয়। আমাদের নব্য-সমাজ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এখনো সেকাল ও একালের মধ্যে দোদুল্যমান বলে' এ সব বিষয় একটা দু'তর্‌ফা ডিক্রী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোন একটি উচ্চপদস্থা স্বদেশিনী একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-নীতি বিধি-বদ্ধ করে ফেলা উচিত। কিন্তু সে বিধান গড়বেই বা কে, আর মানবেই বা কে? সামাজিক আইন জারি করবার জন্য যখন কোন উপর-আদালত নেই, তখন এ সকল নিয়ম আবশ্যকের চাকে এবং সুরুচির হাতে আপনি গড়ে উঠতে দেওয়াই ভাল। তবে মেয়েদেরই প্রধানতঃ এ কাজে হাত লাগাতে হবে। কারণ অন্যত্র যাই হোক্, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরই বিধান শিরোধার্য্য।

(৬)

আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মের অভাব আমাদের নেই, কিন্তু সে গণ্ডির বাইরে গেলেই যেন জলে পড়তে হয়, কারণ মেয়েদের তার বাইরে যাবার হুকুম সেকালে ছিল না। একালে যখন তা' হয়েছে, এ ং সখ ও আবশ্যকমত পরিচিত অপরিচিত, স্বদেশী বিদেশী সকল রকম সমাজেই আমাদের মেয়েদের অল্পবিস্তর মিশতে হচ্ছে, তখন লোকব্যবহারের কতকগুলি অলিখিত নিয়ম মেনে চলা নিতান্তই দরকার। সেগুলি দেশব্যাপী হওয়া, বা সকল সমাজে গ্রাহ্য হওয়া

যদিও এখনি আশা না করা যায়, তবুও স্বসমাজে, অন্ততঃপক্ষে স্বপরিবারে চালাবার চেষ্টা করা যেতে পাবে, এবং অনেকস্থলে করা হয়েও থাকে। যথা—কারো কারো মতে যে-পরিবারের মেয়েরা বেরোন না, সে পরিবারের পুরুষদের সামনে অন্য পরিবারের মেয়েদের বেরোনো উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, এবং আছে; কিন্তু যাঁরা এই মত অনুসারে চলেন, তাঁরা ভেবেচিন্তে নিদেন একটা কোন সঙ্গত সামাজিক নিয়ম বের করেছেন, এটা মানতেই হবে। নিয়ম থাকাও চাই, অথচ এতটুকু নমনীয় হওয়া চাই যাতে অবস্থাভেদে ভেঙ্গে গড়া যেতে পারে,—উন্নতিশীল সমাজের এই লক্ষণ। যদিও নতুন নিয়ম গড়া নয়, পরন্তু গঠিত নিয়ম মেনে চলাই হিসেবমত ভদ্রতার কাজ। কারণ ভদ্রতার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে সহজ ভাব। কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা এসে পড়লেই যেন তার স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই সহজ ভাবটি একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই লভ্য। বস্তুতঃ সহজ হওয়া যে কত শক্ত, তা' সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষারই অগ্রবর্ত্তী উত্তরাধিকারী। এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' মেয়েদের অকাল-স্বাধীনতা দেওয়ার কোন সুফল আমি ত দেখতে পাই নে। অনভ্যাসের সঙ্কোচে যে ন-যযৌ-ন-তস্থৌ ভাব হয়, সেটা বড়ই অশোভন। নিয়মের অভাবে শিক্ষিত মেয়েদেরই অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বোধ হয় ত অন্যে পরে কা কথা। যদি বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমার মেয়েকে ঘরে বন্ধ করেই রাখলুম, তাহলে স্বগৃহের গৃহিণী হওয়ামাত্র হঠাৎ কি করে' সে ব্যাপকতর সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করে' চল্‌বে? সহজ মেলামেশবার ক্ষমতা আয়ত্ত করাবার প্রশস্ত উপায় ছেলেবেলা থেকে

মেলামেশার অভ্যাস করানো। ইংরাজরা ছেলেদের আদবকায়দা বিষয়ে খুব সচেষ্ট ও সজাগ। আমরা তা নই বলে আমাদের অধিকাংশ ছেলে বাইরের লোক সম্বন্ধে হয় বেশী বাচাল ও বেচাল কিম্বা বেশী সঙ্কুচিত ও ভীত হয়। বড়রাও যে সে দোষমুক্ত, তা' নয়। এ সব কেবল অনভ্যাসের ফল,—এবং তার প্রতিবিধান বাপমায়েরই হাতে। লোকসমাজে স্বীয় সন্তানগণ যাতে সহজ, সদয়, সুরুচিপূর্ণ সংযত ও স্বদেশীভাবানুমোদিত ব্যবহার করতে শেখে, এই পঞ্চ 'স'কারের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে 'lady' ও 'gentleman' শব্দে ভদ্রব্যবহারের যে উচ্চ আদর্শ সূচিত করে, তা' রক্ষা করে' চল্‌তে পারলে নৈতিক উপদেষ্টার আর বড় কিছু বল্‌বার বাকি থাকে না।

আমাদের দেশে রাজদরবার ছিল না বলে', কিম্বা যে কারণেই হোক্,—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কি একটু অভাব লক্ষিত হয়?—উচ্চনীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতের সঙ্গে দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নেই; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিম্বা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। এ সকল অভাবমোচন বা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা একালের মেয়েদের একটি কর্ত্তব্য কাজ। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি আমরা দায়ে পড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে,—মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে বসে' একটা

মন-গড়া নিয়ম মানলেই ত যথেষ্ট হ'ল না। দশজনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা' রয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হয়। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে বসে' বসে' তা'কে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে—এখনো যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যা'তে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। যথা :—ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অভিবাদন সব জাতেই যেন সমানভাবে পায়, 'শ্রীমতী' ও 'দেবী' প্রভৃতি সম্মানার্থক সম্বোধনই যা'তে সমাজে প্রচলিত হয়, ইত্যাদি।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করা গেল, তেমনি সেই বাইরের সমাজে আবার কথোপ-কথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ ক্ষণিক মেলা-মেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতেকলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোট-খাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তাও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশি তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপ-কথনস্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা' সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে দোষবর্জ্জিত নন। প্রথমতঃ, আমরা প্রায় সকলেই বেশি চেঁচিয়ে কথা কই; দ্বিতীয়তঃ, তর্ক-স্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ, আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি—(হিত অথচ

মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমঝদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয় ?); চতুর্থতঃ, আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা বলে' যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হতে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিই নে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের গল্পগোষ্ঠী হয় একটা গোলে-হরিবোলে পরিণত হয়, যেখানে সকলেই একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শোনে না ;—কিম্বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'one-man-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। যদিও সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা বা সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সুফল। পঞ্চমতঃ, আমরা জেনেশুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা' উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর, অথবা এমন করে কথা বলি যা'তে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যা'কে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"। —দরকার কি ? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি-উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না করেও বোধহয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। কবিতা যদি "কি-যেন-কি"র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ত সমাজকে মনে কর "যেন"র উপর প্রতিষ্ঠিত ; মনে মনে যার যাই থাক্, লোকসমাজে এমন ভাবে চল যেন সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঠিক আছে, যেন তোমাকে দেখে আমি ভারি

খুসি হয়েছি, যেন তোমার জন্যে এ কাজটুকু করে দিতে পারায় তোমার নয়, আমারই লাভ। আর ভেবে দেখতে গেলে সেটা এমনই বা শক্ত কি? কেনই বা শুধু মৌখিক হবে? আত্মীয়তাস্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যেও ভূষিত হওয়া ত সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরাজ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষজ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হলেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও তা' ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যেও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহলে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা' মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে সহজে ভাঙ্গে না!—এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম করে' এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যা'তে একটু শ্রীসম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায়

লিপ্ত আছেন যা'তে সমাজের ছোটখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। বড় কাজ কিছু শুধু ভদ্রতার দ্বারা হবে না সত্য, কিন্তু ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ, ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

লাভালাভ।

—:০:—

কবিরা যে আহাম্মক, তারা যে নিজেদের মঙ্গল নিজেরাই বোঝে না, তারা যে সকল কাজের মধ্যেই কেবল অবিবেচনার পরিচয় দেয় এমনিতর অনেক কথা বুদ্ধিমান লোকেদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় কবিরা নিজেরাই অনেক সময় এমন এক একটা কথা বলে বসেন যা থেকে এইটেই কেবল মনে হয় যে তাদের কোন কাজের মধ্যেই যুক্তি বা বিবেচনার লেশমাত্র নেই; যেমন রবিবাবু এক জায়গায় বলেছেন, "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাই জানে।" উক্ত বুদ্ধিমান লোকেরা একথা শুনে বলে উঠবেন, "যে-সাগরের কুল পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসাতে কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে, যার কুলই পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসিয়ে লাভ কি? এই "লাভ কি"র উপরেই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

উদ্দেশ্য হিসাবে মানুষের লাভালাভ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। চাকরে বাবু যখন ছুটি পেয়ে দেশে যাবার জন্যে ট্রেণে ওঠেন তখন তিনি ক্রমাগতক এই কথাটাই ভাবতে থাকেন যে কতক্ষণে পথ ফুরুবে যে তিনি বাড়ী গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন। এখানে পথটা তাঁর উদ্দেশ্য নয় এটা কেবল তাঁর ঈপ্সিত বস্তুর কাছে নিয়ে যাবার উপায় মাত্র, কাজেই সেটার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, সেটাকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতে পারেন না; কিন্তু যাঁরা ট্রেণে চড়েন বেড়াবার জন্যে,

দুধারের ধানের ক্ষেত আর সবুজ গাছপালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে তাঁরা ভাবেন পথ না ফুরুলেই বাঁচি। ট্রেণ যতক্ষণ চলে ততক্ষণই যে তাঁদের লাভ। এখানে পথটাকে উপভোগ করাই যে তাঁদের উদ্দেশ্য কাজেই পথ যত না ফুরোয় ততই তাঁদের লাভ। এইখানেই কবি আর সাংসারিক লোকের তফাত। সাংসারিক লোকদের উদ্দেশ্য বাড়ী পৌঁছান, কাজেই পথ যত শীঘ্র কেটে যায় ততই ভাল আর কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওপারে যাবার পথটাকে উপভোগ করা কাজেই পথটাকে ফুরুতে দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছে নয় কাজেই কবি ত সেই সাগরেই তরী ভাসাবে "যার কুল সে নাহি জানে।"

পথ হাঁটাটাই যে কবির সুখ। সেই অজানার পিছনে পিছনে ছোটাটাই, সেই অকুলের কুল পানে তরী ভাসানটাই যে তার আনন্দ; যদি কুলই পায় তা হলে তরী ভাসান যে তার বন্ধ হয়ে যাবে তাই সে "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাহি জানে।" সে যে চিরকাল এমন সাগরে তরী ভাসিয়ে এসেছে যার কুল-কিনারা পাবার সম্ভাবনা নেই এবং সে যে এমনি অকুলের মধ্যেই তরী ভাসাবে। যদি কুলই সে পায় তবে কুলের জিনিস, কুলের গাছপালা, কুলের আকাশ সবই যে কুহেলিমুক্ত, পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে সে যে স্বপ্ন-রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়বে। যা পাই, যা পাওয়ার মধ্যে বাধা নেই সে ত কবির জিনিস নয়; যা পাই তার মধ্যে যে মাদকতা নেই, তা নিয়ে যে বিভোর হওয়া যায় না। যা না পাই সে যে ঐ না-পাওয়ার ভিতর দিয়ে অনেক পাওয়াকে পাইয়ে দেয়। যে-টাকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি তাকে নিয়ে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে? এটা পাগলামীর কথা নয়, এটা খুব সত্য কথা। এ ভাবটা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর ভাবে আছেই আছে। কোন্ ব্যক্তি না, পুরাতন কোন সহর বা পুরাতন কোন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখতে ভালবাসেন? কেন ভালবাসেন এ প্রশ্ন যদি তাঁরা নিজেদের মনকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন তা হলে মনের খুব অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বলবেই বলবে যে, "ওহে! সেখানে গেলে কল্পনা যে নিজের কাজ পায়। সেখানে যে অনেক এমন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে গোপনতা আছে তার মধ্যে "কি যেন আছে, কি যেন নাই" এমনি একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। নূতন সহর দেখলুম, সে তার সমস্ত অন্তরখানাকে বার করে রেখেছে, মেলিয়ে রেখেছে; আমরা দেখলুম, চলে এলুম, ফুরিয়ে গেল; আসবার সময় বলে এলুম, "এই ত।" কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে "এই ত" বলে হাঁফ ছাড়বার জো নেই; সে যে অর্দ্ধেকটা লুকিয়ে রেখে দিয়ে বল্‌ছে, "ওহে দর্শক সবটা তোমাকে দেখাব কেন, যেটুকু দেখলে তাই থেকে ভেবে নাও আমি কি ছিলুম।" মানুষের ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে তারা সেইটার মধ্যেই মাদকতা পায় যেখানে তাদের মন খাটবার মতন খানিকটা অবসর পায়।

কবি আব্‌ছায়াকেই চায়, সে অকূলের মাঝখানে তরী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, চারিদিকে চেয়ে দেখবে, সুমুখে কূল নেই, পিছনে কূল নেই, আশে পাশে ও তাই; সবই ধোঁয়ায় ঢাকা, তবে ত তার আনন্দ। তবে ত সে ওপারের জন্য পাগল হয়ে উঠবে, তবে ত সে ওপারের পাড়ির বন্দোবস্ত করবে। ওপারে কি আছে তা না জানতে পারাটাই যে তাকে ক্রমাগতক ডাকছে, "আয় আয়"। ঐ অজানার মধ্যেই যে তার ঈপ্সিতের বাসভূমি, ঐ অজানার মধ্যেই যে তার অপরিচিতের আহ্বান।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

"ঘরে-বাইরে"।

আমি রবিবাবুর উপর্য্যুক্ত নামধেয় পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে বসি নাই, সর্ব্বাগ্রেই এই কথা বলিয়া লইয়া, আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব।

হইতে পারে কারও কারও কাছে বইখানি খুব মন্দ, আবার এমন লোকও থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে উহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অবশ্য একথাও বলা যায়, যে যাহা অপূর্ব্ব তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য নয়, এবং উৎকৃষ্ট জিনিস চাই কি অপূর্ব্ব নাও হইতে পারে!

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষটা নিতান্ত কুনো। ভারতবর্ষের লোক নিতান্ত গৃহবদ্ধ, নিতান্ত আত্মসর্ব্বস্ব! ঘরের বাহিরে আর কোনও ভাল জিনিস আছে কি না, এ খোঁজ লওয়া যাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাঁহারা "আপভালা" হইতে পারেন, "জগৎ" তাহাদের কাছে ভাল নয়। আর সেই যে "আপভালা" তাহাও নিজের কাছে এবং নিতান্ত গায়ের জোরে। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভারতকেও চেনেন না, জগৎকেও চেনেন না। একটা বাঁধিগৎ আওড়ান মাত্র।

বাঁধিগৎ আওড়ানো বিষয়ে ভারতবর্ষের লোক ঠিক টিয়াপাখী। ভারতবর্ষটা কতকগুলো টিয়াপাখীর একটা বৃহৎ খাঁচা ছাড়া আর কি? এই টিয়াপাখীগুলির নিজেদের খাঁচার বাহিরে যাওয়ার ত

ক্ষমতা নাই-ই, অন্য কাহাকেও যাইতে দেখিলেও অমনি বাঁধিগৎ-শাস্ত্রের দোহাই! সমুদ্রযাত্রা নাকি শাস্ত্রনিষিদ্ধ। হাঁচি টিক্‌টিকির মত এই শাস্ত্রবাক্য আমাদের পদে পদে বাধা।

কিন্তু আমরা বাহিরের সংবাদ পাইয়াছি—আমরা বাহিরে যাইতে চাই! গৃহবদ্ধ শিশু রবীন্দ্রের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাতির প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে—আমরা বাহিরের বাঁশী শুনিয়াছি—আমরা আকুল হইয়াছি! আকাশের নিলীমা, বাতাসের গন্ধ, প্রান্তরের শ্যাম-শোভা, গগনের আলো আমাদিগকে ডাকিতেছে—দ্বরজা খুলিয়া দাও আমরা বাহির হইব। কেন এ বন্দীত্ব, কেন এ প্রাণান্তকারী অবরোধ।

ধরিয়া লওয়া যাউক এ ঘর খুব ভাল; কিন্তু বাহিরের জন্য যে ক্ষুধা সে ক্ষুধা ত আমার ঘরে মিটিবে না! বাহিরে বিপদ থাকিতে পারে ঘরেও ত কম নাই। বাহির হইলে মরিব কিন্তু ঘরে বসিয়া চিরায়ু হইব এ গ্যারাণ্টি কেহ দিতে পারে? অনেক দিন তো বাঁচিয়া আছি, বাহিরে গিয়া না হয় একটু মরিয়াই দেখি, বাহিরে কি কেবল শ্মশান? কেবল শ্মশানই যদি হয়, ওরে নাস্তিক, শ্মশানের পর কি আর কিছু নাই?

কিন্তু বাহিরটা তো শ্মশান নয়, ওখানেও অনেকে জন্মিয়াছে, ওখানেও অনেকে বাঁচিয়া আছে। ঘরেও তোমার সেক্সপিয়ার হেগেলের মত লোক ভূরি ভূরি জন্মে নাই! বাহিরেও কবির অভাব নাই, রাজনীতিকের অভাব নাই, জ্যোতির্ব্বিদ-গণিৎবিদের অভাব নাই, দার্শনিকের অভাব নাই, জ্ঞানের অভাব নাই, তত্ত্বের অভাব নাই, বৈরাগ্যের অভাব নাই, ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের অভাব নাই, কৃষ্ণের অভাব নাই, রামের অভাব নাই! আর তোমার ঘরের সবই যে পরের

সবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; বাহিরের সঙ্গে তুলনা না করিয়া কেমন করিয়া বুঝিব। তোমার নিষেধ বাক্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে?

ঘরের বিমলা যদি বাহিরের সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, দাও তাকে আকৃষ্ট হইতে! সন্দীপ যদি নিতান্তই মন্দ হয়, তোমার ঘরের বিমলাকে কি তুমি এতটুকু শিক্ষাও দেও নাই যাহাতে সে ফিরিয়া আসিতে পারে? যদি না ফিরিয়া আসে? এতটুকু ভরসা যার উপরে তুমি রাখ নাই, তাহাকে লইয়া ঘর করিবে কেমন করিয়া? নিষেধে? শাসনে? গঞ্জনায়? এইরূপে একটি জাতিকে ঠিক রাখিবে? সম্ভব হয় রাখ। শাসন করিয়া, নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইয়া কে কাহাকে বশে রাখিতে পারে? একটা জাতিকে? পাগল! যে জাতি উন্মুক্ত উদার বাহিরের স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে? চেষ্টা কর।

কিন্তু ঠিক জানিও, বিমলার স্বামী নিখিলেশ হইলেই তবে বিমলা ঘরে ফেরে, নহিলে বিমলা ফিরিলেও পাততা হয়! অমন বিমলাও! আর মনে রাখিও, যদি দেশের উন্নতি সম্ভবপর হয়, তুমি সমাজ, বিলাত-ফেরৎ বলিয়া যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহাদের দ্বারাই হইবে। তোমার তাম্রকূটধ্বংশপরায়ণ চণ্ডীমণ্ডপাধিষ্ঠিত আর্য্যবংশ-ধরদিগের দ্বারা নয়! আর বাহিরকে অগ্রাহ্য কর তুমি, যাহার দৌলতে তুমি বাঁচিয়া আছ, যাহার বস্ত্রে তুমি লজ্জা নিবারণ কর, যাহার আলোয় তোমার দীপ জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথ কবি,—তাঁহাকে ঋষি না বল তোমার ঋষিরা শাস্ত্র লইয়া বাঁচিয়া থাকুন—তিনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি; বঙ্গদেশকে বিধাতার এক অমূল্য দান, বাল্যে যাঁহার চিত্ত বাহিরের জন্য আকুল হইয়া-

ছিল, এবং যিনি সেই বাহিরের আলো-বাতাসের সংবাদ তোমার অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বারের কাছে আজীবন গাহিয়াছেন, তুমি তাঁহার সঙ্গীত বুঝিতেছ না, তাঁহাকে দূরে রাখিতেছ! ইচ্ছা করিয়া যদি প্রতারিত হইতে চাও, হও; সেও ভাল,—যদি কোনও দিন অনুতাপের দিন আসে! অহমিকার বিষে জর্জ্জরিত তোমরা, এই কবিকে চিনিলে না!

দ্বিজেন্দ্রলালকে তোমরা বাহবা দিয়াছ, অথচ তাঁহার কথা তোমরা বোঝ নাই! আর ইঁহার কথাও তোমরা বুঝিতেছ না। মুক্তির বাণী কি তোমাদের কাছে এতই দুর্ব্বোধ্য! নিজের পায়ের শিকল চিনিতেও কি তোমাদের এত দেরী হয়? সত্যই তাহা হইলে, দাসত্বের জন্য এমন উপযুক্ত জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

যদি স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে, তাহার অভাব বোধ করিতে, তাহা হইলে কবির "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" দেশের বালক-বৃদ্ধের হাতে দেখিতাম! কেবল ঐ একটি প্রবন্ধ হাতে লইয়া একটি জাতি মুক্ত হইতে পারে,—যদি সে মুক্তি চায়! কিন্তু দেশের এমনি অদৃষ্ট, ঐ প্রবন্ধেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে! ঐ প্রবন্ধের লেখকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও কেহ কেহ গভীর সংশয় প্রকাশ করিতেছেন! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে?

শ্রীঅরবিন্দ সেন।